আজি হতে শতবর্ষ পর

সাল:-2145

অনির্বাণ এখন ক্লাস এইটে পড়ে। পুরো নাম অনির্বাণ রায়। তবে সকলে ওকে অনি বলেই ডাকে। অনি তার বাবা মায়ের সঙ্গে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদে বসবাস করে। ৫০ বছর আগে থেকে মানুষ চাদে বাস করতে শুরু করেছে। ক্রমে চাদের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। অনি কোনোদিন পৃথিবীর আবহাওয়া কেমন, তা সে দেখে নি । তাই পৃথিবী সম্পর্কে ওর কৌতূহল অপরিসীম। অনি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে। এই সংবাদপত্রগুলো চাঁদ থেকে প্রকাশিত হলেও পৃথিবীতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে কিছু লেখা বেরোলে তা খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে নেয় অনি। এই যেমন কিছুদিন আগেই কাগজের হেডলাইন বেরিয়েছিল - 'প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়া।' অনি আরো জেনেছে যে এখন পৃথিবীতে অতি সামান্য পরিমাণ বনভূমি অবশিষ্ট রয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে পৃথিবীর বড়ো বড়ো শহরগুলি যেমন মুম্বাই, নিউইয়র্ক সমুদ্রের তলায় চলে যাচ্ছে । তার কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে সমুদ্রের জলের স্তরবৃদ্ধি । এই সকল ঘটনার ফলে পৃথিবীর মানুষ ভীত এবং শঙ্কিত। তাই মানুষজন ক্রমেই চাঁদে এসে বসতি গড়ে তুলছে ।

চাঁদ অবশ্য এখন পৃথিবীর মতোই সুন্দর, শস্য - শ্যামলা হয়ে

উঠেছে। চারিদিকে সবুজ ধানক্ষেত ও অন্যান্য ফসলে ভরা মাঠ - গাছে গাছে ফুল, ফল, পাখির ডাক। গ্রামের এই দৃশ্য সকলকেই মুগ্ধ করে। যেদিন থেকে বিজ্ঞানীরা চাঁদের মাটিতে ফসল ফলানোয় সফল হয়েছেন, সেদিন থেকেই চাঁদের মাটি হয়ে উঠেছে সবুজ ফসলে পরিপূর্ণ। এছাড়াও অনেক বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে। সেখানে স্কুল, কলেজ, অফিস, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, বাজার, দোকান তৈরি হয়েছে। আর বেশ কিছু কারখানা রয়েছে। সেগুলিতে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও খাদ্যবস্তু, বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরি করা হয়। তবে এই কারখানাগুলির একটা বিশেষত্ব আছে। এগুলিতে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করা হলেও পরিবেশে কোনো দূষণ ছড়ায় না। এর ফলে শহরের পরিবেশ অনেকাংশেই দূষণমুক্ত। রাস্তায় যে গাড়িগুলো চলে, সেগুলো থেকেও দূষণ হয় না। চাঁদকে অন্তত দূষণমুক্ত রাখতে এই পদক্ষেপগুলো খুবই জরুরি। এখানে রান্নাও করতে হয় সূর্যালোকের সাহায্যে। তাই প্রত্যেক বাড়িতে রয়েছে সোলার সিস্টেম। প্রথম প্রথম মানুষ যখন এখানে থাকতে শুরু করল, তখন প্রধান দুটো সমস্যা দেখা গিয়েছিল - শ্বাসকষ্ট ও জলের অভাব। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীরা দুটো সমস্যারই সমাধান করলেন। চাদের চারদিকে তৈরি হলো কৃত্রিম বায়ুমন্ডল। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করা সহজ হল। এরপর বিজ্ঞানের হাত ধরেই মানুষের জলের চাহিদাও মিটল।

চাঁদে এখন অনেক বড় বড় সমুদ্র রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন রকমের সামুদ্রিক প্রাণী, মাছ ঘোরাঘুরি করে। চাঁদের যে অংশগুলোয় গভীর গর্ত ছিল, সেখানে সমুদ্র খুব গভীর। চাদে

এখন দুটি বিশাল স্থলভাগ এবং একটি অখন্ড জলভাগ গঠিত হয়েছে। স্থলভাগের অনেকাংশ জুড়েই রয়েছে ঘন সবুজ বনাঞ্চল। সেখানে নানা ঋতুতে নানা ফুল ও ফলের সম্ভার। এগুলি দিয়েই অনেক মানুষ জীবনযাপন করে থাকেন। চাঁদে মানুষ এখন খুব ভালোভাবেই বসবাস করছে।

তবে এখানে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটা হল এখানকার দৈনন্দিন জীবনে মানুষের যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়, তা সৌরশক্তির সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। আবার কোনো উপায়ে পৃথিবী থেকে জ্বালানি নিয়ে এসে ব্যবহার করাও খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে চিন্তা - ভাবনা করছেন । এইসকল বিজ্ঞানীদের মধ্যে মাইকেল কফট, ভিন্টন হোমস্ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এই বিষয়ে গবেষণা করছেন বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী তথা বঙ্গসন্তান ডঃ সুকুমার চট্টোপাধ্যায় । বিশ্ব বিজ্ঞান পরিষদে তিনি একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। এবছর তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। তবে নোবেল কর্তৃপক্ষ এবছর জানিয়ে দিয়েছেন যে এবছরের নোবেল প্রদান অনুষ্ঠানটি পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হচ্ছে না। চাঁদের কোনো অডিটোরিয়ামে নোবেল দেওয়া হবে।

ডঃ চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে সৌরশক্তির সাহায্য নিতে চাইছেন। তাঁর মতে, এমন কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন যার সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে আরও অনেক শক্তিসম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কারণ, এখানে জলকে পরিশোধন করতেও সৌরশক্তি ব্যবহৃত হয়।

একদিন সকালে তিনি জানালার ধারে বসে ভাবছিলেন যে কীভাবে এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এমন সময় তার মোবাইলটা বেজে উঠল। ফোন করেছেন তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধু মাইকেল কফট । বললেন, “ডঃ চট্টোপাধ্যায়, আপনি একবার অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে আসতে পারবেন ? বিদ্যুৎশক্তির এক নতুন অধ্যায়ের খোঁজ আমি পেয়েছি। আপনাকে আমি সেটা দেখাতে চাই। তাছাড়া আপনার সাহায্যও আমাদের একান্ত কাম্য । অনুগ্রহ করে চলে আসুন।’ - ‘কিন্তু কোথায় যেতে হবে ??

আমি আপনার বাড়িতে আপনাকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমরা জাহাজঘাটায় মিট করবো।

- ঠিক আছে। আমি আসছি।

ডঃ চট্টোপাধ্যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে গাড়িতে চেপে জাহাজঘাটায় পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁর বন্ধু । ডঃ চট্টোপাধ্যায় জাহাজে উঠতেই জাহাজটা হুইসেল দিয়ে ছেড়ে দিল।

এই জাহাজে তাঁরা দুজন ছাড়া আর মাত্র একজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন। তিনি একজন সুইডিশ ব্যবসায়ী। নাম জন ক্যানিং হোম । বন্ধু মাইকেল কফট জানালো যে, সে কিছুদিন আগে যখন চাঁদের পাথর ও মাটি নিয়ে গবেষণা করছিল তখন এই সুইডিশ ভদ্রলোক তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন । জাহাজটাও এই ভদ্রলোকেরই। এটা তাদের জন্য স্পেশাল বলে অন্য

কোনো প্যাসেঞ্জার নেই।

জাহাজটা তখন মাঝ সমুদ্রে চলে এসেছে। সেখান থেকেই একটা সাবমেরিন দেখা যাচ্ছিল। আরও কাছাকাছি আসতেই জাহাজটা স্টার্ট বন্ধ করে দিলো । তখন ডঃ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর বন্ধু এবং সুইডিশ ব্যবসায়ীটি ছোট একটা নৌকায় চেপে ডুবো জাহাজটার কাছে গেল। তারপর ডুবোজাহাজে চড়ে বসলেন তিন ব্যক্তি। তাদের নিয়ে সাবমেরিনটা জলের তলায় ডুব দিলো । খুব দ্রুত ছুটে চললো। চারপাশে জলের মাছ, অক্টোপাস দেখতে দেখতে তাঁর পৌঁছে গেলেন একটা জায়গায়। মাইকেল ওনাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন যে, কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না।

ডুবো জাহাজটা যেখানে থামল, সেখানটা খুব অন্ধকার, জলের চাপ অত্যন্ত বেশি। সাবমেরিনটা বেশ উন্নত বলেই কোনো ক্ষতি হয়নি ।

‘আসুন, ডঃ চট্টোপাধ্যায়’ বললেন মিস্টার কফট ‘এটাই হল চাদের গভীরতম গর্ত - ক্লেভিয়াস।

এখানেই সেই অদ্ভুত জিনিস পাওয়া গেছে।' জন বললেন ‘জানেন এখানে যে জিনিসটা পাওয়া গেছে তার কথা জানাজানি হলে বিজ্ঞান মহলে হইচই পড়ে যাবে।

- ‘তাহলে চলো গিয়ে দেখি, কোথায় আছে সেটা ?’

‘আসুন আমার সঙ্গে । এখানে যে একটা বড় খনি দেখা যাচ্ছে, তার যাওয়ার জন্য একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে। এই সাবমেরিনটা সুড়ঙ্গের মুখের সঙ্গে আটকে যাবে, তখন সাবমেরিনের দরজা আর সুড়ঙ্গের দরজা খুলে যাবে।

ঠিক তাই হল, দরজা খুলে যেতেই ওনারা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খনির মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রথম দেখায় ডঃ চট্টোপাধ্যায় এর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পাথরের মাঝে মাঝে উজ্জ্বল নীল রঙের পাথর।

‘এই পাথরগুলো এমনিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু এতে সূর্যরশ্মি পড়লেই এখান থেকে ১০০ গুণ শক্তি নির্গত হয়। আমি চাই আপনি এই পাথরগুলোর সাহায্যে একটি যন্ত্র তৈরি করুন। এতে মানবজীবনে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের নতুন দিক খুলে যাবে।’– বললেন মাইকেল।

“তোমার চিন্তাভাবনাকে স্যালুট জানাই । আমি অবশ্যই এইরকম যন্ত্র আবিষ্কার করবো ।” উঃ চট্টোপাধ্যায় কথা দিলেন।

কথা রেখেছিলেন সুকুমারবাবু । তাঁর তৈরি যন্ত্র এখন বাড়িতে বাড়িতে ব্যবহৃত হচ্ছে । এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন দুই বন্ধু ।

এই ঘটনাটা পরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । অনি এই ঘটনার কথা জানতে পারে ম্যাগাজিন পড়েই । এরপর তার একটাই কবিতা মনে পড়ল - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

লেখা -

“আজি হতে শতবর্ষ পরে

কে তুমি পড়িছ বসি

আমার কবিতাখানি

কৌতূহল ভরে।।”

- **শৌমিক পাত্র**
- **দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগ)**
- **ক্রমিক সংখ্যা – 18**